৬৯তম জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশন

ভাষণ

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতিসংঘ সদরদপ্তর
নিউ ইয়র্ক
১২ আশ্বিন ১৪২১
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

আসসালামু আলাইকুম এবং Very Good Morning to you all.

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৯তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। একইসঙ্গে ৬৮তম সাধারণ অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদানের জন্য আমি রাষ্ট্রদূত John Ashe-কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশ্বশান্তি, সমৃদ্ধি এবং মানবকল্যাণে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালানোর জন্য আমি মাননীয় মহাসচিব বান কি মুনকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সম্মানিত সভাপতি,

চার দশক আগে জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রথম ভাষণে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি নতুন বিশ্বব্যব্যস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: কোট ‘‘বাঙালি জাতি শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, সামাজিক ন্যায়বিচার, এবং দারিদ্র্য-ক্ষুধা-আগ্রাসনমুক্ত এবং বৈষম্যহীন একটি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।” আনকোট। তাঁর সেই স্বপ্নই বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন অভিযাত্রা এবং আমাদের বৈশ্বিক কর্মকাণ্ডের মূলভিত্তি।

আমরা এমন এক সময়ে এখানে সমবেত হয়েছি যখন বৈশ্বিক উন্নয়ন আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়েছে। এমডিজি বাস্তবায়নের সময়সীমা শেষ হতে চলেছে। বর্তমানে বিশ্বসম্প্রদায় ২০১৬-২০৩০ মেয়াদের জন্য একটি সংস্কারমূলক উন্নয়ন এজেন্ডা প্রণয়নের কাজে ব্যস্ত রয়েছে। সে প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের এবারের প্রতিপাদ্য অত্যন্ত সময়োচিত বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ বিশ্বাস করে, আমাদের আলোচনা একটি সমতাভিত্তিক, সময়োপযোগী এবং উচ্চাভিলাষী এজেন্ডা প্রণয়নে সহায়ক হবে।

সম্মানিত সভাপতি,

স্থায়ী শান্তি এবং নিরাপত্তা ব্যতিত আমরা টেকসই উন্নয়ন অর্জন করতে পারব না। আন্তর্জাতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অস্থিতিশীল বৈশ্বিক নিরাপত্তা অবস্থা এখনও বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

বাংলাদেশ বিশ্বাস করে, বিশ্বের যেকোন স্থানে শান্তি বিঘ্নিত হলে তা গোটা মানবজাতির জন্য হুমকিস্বরূপ। আমাদের নীতিগত অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা ফিলিস্তিনি জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকারের বৈধ সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সংহতি ঘোষণা করছি।

সম্প্রতি গাজায় ইসরায়েলি বাহিনী কর্তৃক ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুসহ শত শত সাধারণ নাগরিক হত্যার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। ১৯৬৭-পূর্ব সীমানার ভিত্তিতে আল কুদস আল শরীফ-কে রাজধানী করে একটি স্বাধীন এবং স্থায়ী ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে আমরা এই দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের টেকসই সমাধান চাই।

বাংলাদেশ বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা এবং উন্নয়নের বৈধ রক্ষক হিসেবে জাতিসংঘের ভূমিকার প্রতি দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আমাদের তাৎপর্যপূর্ণ Culture of Peace and Non Violence প্রস্তাবের ফলেই আন্তর্জাতিক শান্তির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটেছে।

শান্তির পক্ষে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সর্বোচ্চ সৈন্য ও পুলিশ সদস্য প্রেরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অবস্থান আবারও সুদৃঢ় হয়েছে। এ পর্যন্ত আমরা ৫৪টি মিশনে ১ লাখ ২৮ হাজার ১৩৩ জন শান্তিরক্ষী প্রেরণ করেছি। আমি গর্বের সাথে উল্লেখ করতে চাই যে শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ সংখ্যক মহিলা পুলিশ প্রেরণ করেছে।

সম্মানিত সভাপতি,

সন্ত্রাসবাদ এবং চরমপন্থা বিশ্বশান্তি ও উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়। আমার সরকার সব ধরণের সন্ত্রাসবাদ, সহিংস চরমপন্থা, উগ্রবাদ এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রতি শূণ্য-সহনশীল (Zero Tolerance) নীতিতে বিশ্বাসী। প্রতিবেশী বা অন্যদের বিরুদ্ধে যেকোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির কোন ধরণের সন্ত্রাসী কার্যক্রমে বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করতে না দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি আমাদের রাষ্ট্রের প্রগতিশীল এবং উদার চরিত্রকে নস্যাৎ করতে সদা তৎপর। তারা সুযোগ পেলেই ধর্মীয় উগ্রবাদ এবং সহিংসতা ছড়িয়ে দেয়। বিএনপি-জামাত জোট সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বোমা ও গ্রেনেড হামলার মাধ্যমে অসংখ্য উদার রাজনৈতিক নেতা-কর্মী হত্যা করেছে।

এসব নৃশংস হামলা আমাকে দেশ থেকে সব ধরনের সন্ত্রাসবাদ নির্মুল করতে আরও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছে। গত তিন বছরে আমরা সংশোধিত সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০১৩ এবং অর্থ পাচার আইন ২০১২-সহ সর্বোচ্চ সন্ত্রাস বিরোধী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

আদর্শিকভাবে সন্ত্রাসবাদ এবং চরমপন্থা নির্মুলের জন্য আমার সরকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সকল ধর্মের মানুষের ধর্ম পালনের স্বাধীনতার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। শাসন ব্যবস্থায় সচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য আমরা নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন এবং তথ্য কমিশনকে শক্তিশালী করেছি।

আমার সরকার শান্তি ও আইনের শাসন সমুন্নত রাখা এবং দণ্ড-অব্যাহতির সংস্কৃতি থেকে বের হওয়ার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ। এজন্য ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যারা মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছিল, ধর্ষণ এবং গণহত্যার সঙ্গে জড়িত ছিল তাদেরকে বিচারের আওতায় আনা হয়েছে। অত্যন্ত স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে গঠিত স্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন যুদ্ধাপরাধীর বিচারকাজ সম্পন্ন করেছে। আমরা জনগণের দীর্ঘদিনের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পূর্ণ সমর্থন প্রত্যাশা করছি।

সম্মানিত সভাপতি,

আমরা জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এবং রূপকল্প-২০২১-এ এমডিজি'কে অন্তর্ভুক্ত করেছি। এই রূপকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তিনির্ভর মধ্যম-আয়ের দেশ হিসেবে পরিণত করা যেখানে রাষ্ট্রযন্ত্রে জনগণের অংশগ্রহণ আরও সুসংহত হবে।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই এমডিজি-১, ২, ৩, ৪, ৫ এবং ৬ অর্জন করেছে অথবা অর্জনের ক্ষেত্রে সঠিক পথেই এগুচ্ছে। আমরা দারিদ্র্যের হার ১৯৯১ সালের ৫৭ শতাংশ থেকে বর্তমানে ২৫ শতাংশের নীচে নামিয়ে এনেছি।

বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও গত পাঁচ বছরে জিডিপি'র গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.২ শতাংশ। রপ্তানি আয় ২০০৬ সালের ১০ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে গত বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছরে ৩০ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে- যা ৩ গুণ বেশি। প্রবাসীদের রেমিটেন্স প্রেরণের পরিমাণ ২০০৬ সালের ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। একই সময়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩ দশমিক ৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে - যা সাড়ে ছয় গুণ বেশি।

বাংলাদেশের উন্নয়নের সম্ভাবনার দাঁড় উন্মোচনের জন্য আমরা বেশ কয়েকটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছি। আমাদের নিজস্ব সম্পদ দিয়ে দেশের দীর্ঘতম ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার পদ্মাসেতু নির্মাণ কাজ শুরু করেছি। চট্টগ্রামের সোনাদিয়ায় একটি গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এক্সপ্রেসওয়ে এবং রিভার টানেলসহ সড়ক-মহাসড়ক এবং রেলওয়ে অবকাঠামো উন্নয়নের কাজও এগিয়ে চলছে। ২০২১ সাল নাগাদ চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনের বেশ কয়েকটি বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা ভারত, চীন ও জাপানের মত বন্ধুরাষ্ট্রের সাথে এব্যাপারে চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। আঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অব্যাহত গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য সারাদেশে ১৮টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে।

বাংলাদেশের তারুণ্য-নির্ভর জনসংখ্যা অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে। জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ২০৩১ সাল পর্যন্ত অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম থাকবে। আমাদের এই তরুণ জনগোষ্ঠির দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করা অপরিহার্য।

একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সমসাময়িক তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর রাষ্ট্রের এবং জনগণের সক্ষমতা তৈরি করছি। বর্তমানে সাড়ে চার হাজারেরও উপর ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্র থেকে জনগণ দু'শ'রও বেশি বিভিন্ন ধরণের সেবা গ্রহণ করছেন। ১৫ হাজারেরও বেশি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠি প্রযুক্তি-নির্ভর স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেন।

এসব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অত্যাবশ্যকীয় সরকারি সেবা অত্যন্ত স্বল্পখরচে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১১৭ মিলিয়ন মোবাইল সিম এবং ৫০ মিলিয়ন ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে। ৭৮ শতাংশ মানুষের হাতে টেলিফোন সুবিধা পৌঁছেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং প্রাথামিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছেলে ও কন্যা শিশুর ভর্তির অনুপাতে সমতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছি।

আমার সরকার দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। দরিদ্র পরিবারের প্রাথমিক থেকে স্নাতক পর্যন্ত প্রায় ১২.৮ মিলিয়ন ছাত্রছাত্রীকে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। মোট ছাত্রীর ৭৫ শতাংশ উপবৃত্তির আওতায় এসেছে। প্রতিবছর মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রায় ৩১৮ মিলিয়ন পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে।

আমাদের ছেলেমেয়েরা যাতে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মদক্ষতা এবং সত্যিকার অর্থে বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠতে পারে আমরা বর্তমানে সেদিকে বিশেষ নজর দিচ্ছি।

আমি মনে করি টেকসই উন্নয়নের অর্থ হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন এবং জীবনের সকলক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে নারীর সমান অংশগ্রহণ।

উৎপাদনমুখী সম্পদে নারীর প্রবেশাধিকার এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের ফলাফল দৃশ্যমান হচ্ছে। সরকারের সময়োচিত নীতি গ্রহণের ফলে তৃণমূল পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত নারী নেতৃত্ব বিকশিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সম্ভবতঃ বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে প্রধানমন্ত্রী একজন নারী, সংসদের স্পীকার একজন নারী, বিরোধীদলের নেতা এবং সংসদ উপনেতাও নারী। বিচার, প্রশাসন, জনপ্রশাসন, সশস্ত্র বাহিনী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সকল সরকারি চাকুরিতে ১০ শতাংশ পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ৬০ শতাংশ পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত।

সমাজের দুর্বল জনগোষ্ঠিকে সহায়তার মাধ্যমে একটি সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমার সরকার অনেকগুলো সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। জনসংখ্যার ২৪ শতাংশের অধিক মানুষ এসব কর্মসূচির আওতায় এসেছে।

এসব কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ভিজিডি, ভিজিএফ, গৃহহীনদের জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্প, এবং বয়স্ক ব্যক্তি, বিধবা, দুস্থ মহিলা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধীদের জন্য মাসিক ভাতা, গর্ভবতী মায়েদের জন্য ভাতা এবং একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা বিধান।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং তাদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সুদবিহীন ঋণ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি চাকুরিতে এক শতাংশ কোটা সংরক্ষিত আছে।

সম্মানিত সভাপতি,

ইতিহাসে এমডিজি হচ্ছে সবচেয়ে সফল বৈশ্বিক দারিদ্র্য-বিরোধী কর্মসূচি। এই এমডিজির কারণেই বিশ্বের ১৯৯০ সালের তুলনায় দারিদ্র্যের সংখ্যা অর্ধেকে নেমে এসেছে। অধিক সংখ্যক কন্যা শিশু বিদ্যালয়ে যেতে পারছে; কম সংখ্যক শিশু অকালে মৃত্যুবরণ করছে এবং অধিক সংখ্যক মানুষ নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশণ ব্যবহারের সুবিধা ভোগ করছেন।

তবে এ অগ্রগতি বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের মধ্যে এমনকি দেশের অভ্যন্তরেও সমানভাবে সম্পন্ন হয়নি। যদিও সমষ্টিগতভাবে এমডিজির আওতায় দারিদ্র্য বিমোচনের গড় লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে, তথাপি বিশ্বের প্রায় ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন মানুষ এখনও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছেন।

বর্তমানে আমরা একটি নতুন উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে যাচ্ছি। কাজেই ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডায় বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করে দারিদ্র্য বিমোচনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

এ নতুন কাঠামোয় টেকসই উন্নয়নের তিনটি স্তম্ভের মধ্যে ভারসাম্য থাকতে হবে। যেখানে বাংলাদেশের মত দেশগুলোর বিভিন্নমুখী প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা থাকবে।

আমি আনন্দিত যে, জাতিসংঘের Open Ended Working Group কঠোর পরিশ্রম এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের সুপারিশ করেছে।

বাংলাদেশে আমরা এ বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং বৈশ্বিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছি।

আমরা মনে করি, নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাগুলো হবে সযত্নে নির্বাচিত ভারসাম্যমূলক একটি প্যাকেজ। ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডার জন্য যা হবে একটি অপরিহার্য ভিত্তি।

ভবিষ্যৎ উন্নয়ন এজেন্ডায় স্বল্পআয়ের উন্নয়নশীল দেশগুলোর সম্পদ এবং সক্ষমতা সংশ্লিষ্ট দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা সমাধানের উপায় সংক্রান্ত বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে।

এই নতুন উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী একটি সমতাভিত্তিক, সমৃদ্ধশালী এবং টেকসই বিশ্ব গড়ার প্রত্যাশা পূরণের উপায় থাকতে হবে। যেখানে কোন ব্যক্তি বা দেশ বাদ পড়বে না। এ উন্নয়ন এজেন্ডাকে জাতীয় নীতির উর্ধ্বে উঠে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী বহুপাক্ষিক প্লাটফর্ম (Strengthened Multilateralism) সৃষ্টিতে অবশ্যই অবদান রাখতে হবে।

২০১৫ পরবর্তী এজেন্ডার সাফল্য নির্ভর করবে সম্পদের পর্যাপ্ত সরবরাহের উপর। এক্ষেত্রে সাধারণ অথচ ভিন্নভিন্ন দায়দায়িত্ব নীতির ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী এবং বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্ব অপরিহার্য।

আগামী বছরের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ একটি স্পষ্ট প্রতিশ্রুতির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে।

এটা অত্যন্ত আশার কথা যে, কিছু কিছু উন্নত দেশ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের সামষ্টিক জাতীয় আয়ের দশমিক সাত শতাংশ এবং ওডিএ হিসেবে জাতীয় আয়ের দশমিক দুই শতাংশ স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে প্রদান করেছে। কিন্তু হতাশার কথা হচ্ছে, অধিকাংশ দেশই এখন পর্যন্ত এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি।

একইসঙ্গে বিদ্যমান বৈশ্বিক অর্থনীতি এবং জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায়, বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত এবং জলবায়ু-সংবেদনশীল দেশগুলোর জন্য ওডিএ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-উদ্ভাবন এবং সক্ষমতা তৈরির ক্ষেত্রে আরও বেশি করে সমর্থন প্রয়োজন। উন্নত দেশগুলোর বাজারে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সব ধরনের পণ্যের শুল্কমুক্ত এবং কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

সম্মানিত সভাপতি,

বিশ্ব আজ এক অভূতপূর্ব মানব চলাচল প্রত্যক্ষ করছে। বাংলাদেশ আজ বৈশ্বিক অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অন্যতম অংশীদার।

আমাদের সামষ্টিক জাতীয় উৎপাদনে প্রবাসী আয়ের অবদান প্রায় ১৪ শতাংশ। বিভিন্ন দেশে আমাদের লাখ লাখ অভিবাসী কর্মীগণ তাদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন।

রেমিটেন্স ছাড়াও অভিবাসী এবং তাঁদের পরিবারবর্গ আমাদের অর্থনীতি এবং সমাজের জন্য যে বহুমুখী অবদান রেখে চলেছেন, তার স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন।

সুতরাং ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডার দলিলে অভিবাসনকে তার যথার্থ স্থান দিতে হবে। আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য 9th Global Forum on Migration and Development-এ বাংলাদেশ সভাপতিত্ব করবে।

সম্মানিত সভাপতি,

আমাদের মত দেশের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন-জনিত চ্যালেঞ্জ অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে চেয়ে জটিল এবং ভয়াবহ।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক তার সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলেছে ২১০০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে প্রশমন ব্যয় দাঁড়াবে জাতীয় উৎপাদনের দুই থেকে নয় শতাংশের মধ্যে।

এরআগে এই অধিবেশনে আমি উল্লেখ করেছিলাম, এক ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়লে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এক মিটার বৃদ্ধি পাবে। এরফলে বাংলাদেশের পাঁচ ভাগের এক ভাগ এলাকা ডুবে যাবে। ৩ কোটি মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে। জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের জন্য একটি জীবন-মরণ সমস্যা।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় আমাদের জন্য অভিযোজন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ সমস্যা মোকাবিলায় আমাদের জন্য পর্যাপ্ত এবং অতিরিক্ত অর্থায়ন অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই-প্রযুক্তির পর্যাপ্ত সরবরাহ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরিতে সহায়তা প্রয়োজন।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে UNFCCC'র মাধ্যমে জাতিসংঘের নেতৃত্বের বিষয়টি আমি পুনরুল্লেখ করছি। Disaster Risk Reduction (DRR) এবং SDG প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সাথে UNFCCC 'র সমন্বয়সাধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমুদ্রভিত্তিক অনাবিষ্কৃত Blue Economy এর অপার সম্ভাবনার বিষয়ে বিশ্বকে নজর দিতে হবে। উপকূলবর্তী এবং ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলো ভারসাম্যমূলক সংরক্ষণ ব্যবস্থা, এবং সমুদ্র প্রতিবেশ ও সম্পদের উন্নয়ন এবং সেবা কাজে লাগিয়ে যথেষ্ট লাভবান হতে পারে।

সমুদ্রসম্পদ কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশের মত উপকূলবর্তী দেশগুলোর সক্ষমতা, প্রযুক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নয়নে বৈশ্বিক সমর্থনের জন্য আমি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। ২০১৫ পরবর্তী কাঠামোতে Blue Economy সম্পর্কিত নীতিমালা এবং কর্মকাণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে বাংলাদেশ জোরালো সমর্থন দিয়ে যাবে।

সম্মানিত সভাপতি,

বাংলাদেশের তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতেই ১৯৯৯ সালে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

মানবজাতির ৬ হাজার ৫০০ মাতৃভাষা সংরক্ষণের জন্য আমরা ঢাকায় একমাত্র আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছি। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে মাতৃভাষার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

বিশ্বের প্রায় ৩০ কোটি মানুষের মুখের ভাষা বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য আমি এই মহান অধিবেশনের প্রতি আবারও আহ্বান জানাচ্ছি।

সম্মানিত সভাপতি,

বাংলাদেশ এবছর জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের ৪০ বছরপূর্তি উদ্‌যাপন করছে। এ বিশেষ মুহূর্তে আমি আমার জনগণের পক্ষ থেকে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তা পুনর্ব্যক্ত করতে চাই।

কোট - আসুন, আমরা সবাই মিলে এমন একটি বিশ্ব গড়ে তুলি, যা দারিদ্র্য, ক্ষুধা, যুদ্ধ এবং মানবিক দুঃখ-দুর্দশা নির্মূল করতে পারে এবং মানুষের কল্যাণের জন্য বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে- আনকোট। আপনাকে ধন্যবাদ, সম্মানিত সভাপতি।

খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
জাতিসংঘ দীর্ঘজীবী হোক।